International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.65-72
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.65-72

Kierkegaard এর দর্শন আলোকে বাস্তবে মানব জীবন নান্দনিক, নৈতিক, ধর্মীয় জীবনের প্রভাবঃ একটি পর্যালোচনা

পলাশ কান্তি মণ্ডল

স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ, সংস্কৃতি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Soren kierkegaard is an important philosopher in western philosopher. He was the first philosopher who felt the need for a philosopher explanation of the concept of human existence. kierkegaard speaks of three levels of human life in the context of filling 'Human existence'. these levels are – Aesthetic life, Ethical life,Religious life, .These levels are subject of discussion in my article. kierkegaard mainly chose Hegel's philosophy and dialetical theory as an opponent in his interpretation of human existence. Because the main content of Hegel's philosophy is metaphysics, this metaphysic is centered on the absolute bing .but according to kierkegaard, the daily active existence of man is the lived life of mam. So human presant life cannot be explanined by any philosophical mathod or metaphysic. In fact, we cannot explain human existence with any kind of logic .we see man realizing his existence through his own uniquenss, freedom, frustration, and obligation this article discusses how people move from one stage and from imperfection or limitation to the next stage. finally,the three stages that kiergegaard gave in human life, how much influence they actually have on human life, in this articale I will evaluate from my own point of view.

Keywords: soren kiergegaard, Human existence, Aesthetic life ,Ethical life, Religious life, Hegel's philosophy, Dialectical theory, Metaphysics, Absolute Being, Uniqueness, freedom, frustration, obligation, imperfection, limitation.

Introduction: আমরা সাধারনত লক্ষ্য করলে দেখতে পাব যে, পাশ্চাত্য দার্শনিক ইতিহাসে kierkegaard এর পূর্বে কোন দার্শনিক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আস্তিত্ব নিয়ে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম kierkegaard 'মানব আস্তিত্ব' নিয়ে ভেবেছিলেন। তাই kierkegaard কে আস্তিবাদী দর্শনের জনক বলা হয়। Kirekegaard এর দর্শনের মূল আলোচ্য কেন্দ্র বিন্দু ছিল 'মানব অস্তিত্ব'। তাঁর কাছে 'আস্তিত্ব' শব্দাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। তাঁর কাছে 'আস্তিত্বশীল হওয়া' এবং 'বেঁচে থাকা' একই অর্থ বহন করে না।কেননা মানুষ শুধুমাত্র জৈবিক, মনস্তাত্তিক বা সামাজিক প্রাণী নয়। মানুষ তার ভাবাবেগ এবং আন্তরমুখীনতার মাধ্যমে আস্তিত্ব শীল হয় এবং ব্যাক্তি নিজেই তাঁর নিয়ন্ত্রক ও তার মুল্যের স্রষ্টা হয়। kierkegaard মূলত হেগেলের দ্বান্দিকতা (dialectic theory) ধারনা থেকে মানব

জীবনের আস্তিত্ব এর তিনটি স্তরের উল্লেখ করেন। যথা- Aesthetic life (নান্দনিক জীবনের স্তর), Ethical life (নৈতিক জীবনের স্তর), Religious life (ধর্মীয় জীবনের স্তর)। সাধারণত আমরা ব্যাক্তি মানুষের জীবনে উক্ত তিন প্রকার স্তর সবচেয়ে বেশি দেখতে পাই। কিন্তু kierkegaard বলেন যে প্রত্যেক ব্যাক্তি যে প্রথম স্তর থেকে শেষ স্তরে পৌঁছাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাঁর মতে কোনো ব্যাক্তি সারা জীবন একটি স্তরেই আতিবাহিত করে আবার অধিকাংশ ব্যাক্তি দুটি স্তরে অর্থাৎ [নান্দনিক স্তর (Aesthetic stage), ও নৈতিক স্তর (Ethical stage)] জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তিনি বলেন যে দ্বান্দিকতার (dialectic) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাক্তি একটি স্তর থেকে অপর একটি স্তরে পৌছায়। এক্ষেত্রে ব্যাক্তি একটি স্তরে সিমাবদ্ধতা বা অপূরণতা সম্মুখীন হয়ে অপর আরেকটি স্তরে প্রবেশর আগ্রহ প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত উল্লিখিত বিষয় যে, kierkegaard মানব আস্তিত্ত্বের প্রসঙ্গে যে দ্বান্দিকতার (dialectic) এর কথা উল্লেখ করেছেন, তা হেগেলের দ্বান্দিকতার (dialectic theory) ধারনার থেকে গ্রহন করলেও, তিনি দ্বান্দিকতা প্রক্রিয়াটি কে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত, হেগেলের দ্বান্দিকতা পদ্ধতিটি (dialectic theory) হল পরিমাণগত দ্বান্দিকতা (Qunentiative Dialectic)। কেননা, হেগেলের দর্শনে দ্বান্দিকতার (dialectic) ধারনাটিকে "এক" এবং "বহু", "বিশেষ" এবং "সার্বিক" ,"বিষয়ীগত" এবং "বস্তুগত",- এই বিপরীতের মধ্যে সঙ্গতি অথবা পূর্ণ সামঞ্জ স্থাপনের জন্য ব্যবহার করেছেন। তাই এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে হেগেলের দর্শনের দান্দিকতা (dialectic) এর মূল লক্ষ্য হল সমঞ্জস্য স্থাপন করা। কিন্তু kierkegaard যে দান্দিকতা (dialectic) ধারনা দিয়েছেন তা গুণগত দ্বান্দিকতা (Qualitive Dialectic)।এই দান্দিকতার উৎস হল জাগতিক জীবন, আর ব্যাক্তির জাগতিক জীবনে আধিবিদ্যক সত্তার কোনো ভুমিকা নেই ।বাস্তবে ব্যাক্তি নিজেই স্বাধীনভাবে আস্তিত্বের স্তরটি নির্বাচন করতে পারে। তাই ব্যাক্তির কাছে কোন স্তরটি তাৎপর্যপূর্ণ হবে তা ব্যাক্তির স্বাধীন ইছার ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দেখা যাছে যে, kierkegaard দর্শনে অস্তিতের ধারনার ক্ষেত্রে ব্যাক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি অনেক বেশি প্রশারিত হয়েছে। এই নিবন্ধে মানব জীবনের আস্তিত্বের স্তর গুলিতে বাস্তবে ব্যাক্তি কিভাবে স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করে, তার আলোচনার করার চেষ্টা করেছি।

Aesthetic life (নান্দনিক/সৌন্দর্য চেতনার স্তর): মানব জীবনের আস্তিত্বের প্রাথমিক স্তর হল নান্দনিক স্তর (Aesthetic life)। kierkegaard বলেন নান্দনিক স্তর হল বিশুদ্ধ তাৎক্ষনিক সুখের জীবন (Immeadiate pleasurer)। কেননা ব্যাক্তি এই স্তরে কেবলমাত্র তার জীবনে তাৎক্ষনিক সুখ বা পরিতৃপ্তি লাভ করে।নান্দনিক স্তরে ব্যাক্তি কোনো প্রকার সার্বিক নিয়ম নিতি নীতি অনুসরন করে চলে না। এক্ষেত্রে ব্যাক্তি তার সকল প্রকার দুঃখ, কষ্ট, অসন্তোষ, বিরক্তি, ইত্যাদি এই সমস্ত কে সম্পূর্ণ রুপে এড়িয়ে চলে। এই স্তরে ব্যাক্তির জীবনে মূল লক্ষ্য হল তাৎক্ষনিক সুখ অর্জন করা।ব্যাক্তি এক্ষেত্রে কোনো প্রকার নৈতিক দায়িত্ব বোধ আছে বলে মনে করে না। এই স্তরে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ নিজের ভাললাগার বিষয় গুলি করে থাকে। ব্যাক্তি এই নান্দনিকতার স্তরে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সংবেদনের সুখের অন্বেষণ করে।তাই ব্যাক্তির এই স্তরে কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক সুখ লাভ হয় না। kirekegaard নান্দনিক স্তর (Asethetic life) কে 'Unreflective life' বলেছেন। কিন্তু তিনি এই স্তর কে অবৈদ্ধিক বা (Uninteligent) বলেননি।

Kirekegaard বলেন যে ব্যাক্তির নান্দনিক জীবনের স্তরটি বৈদ্ধিক। কেননা ব্যাক্তি এই স্তরে ব্যাক্তির যে সম্পূর্ণ রুপে বুদ্ধি লোপ পায় তা এমনটা নয়। কারন ব্যাক্তি এই স্তরে সবচেয়ে বেশি সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে,ব্যাক্তি মহৎ কোনো কাজ করে, ব্যাক্তি এই স্তরে আবিস্কার মুলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে

পারে। এই স্তরে ব্যাক্তি দর্শন, সাহিত্য, সংগীত, ইত্যাদি সৃষ্টি করে।তাই এই স্তর এতে ব্যাক্তির বুদ্ধিবৃত্তি থাকে। ব্যাক্তির এই সৃষ্টিশীল চেতনার উৎস হল নান্দনিক চেতনার (Aesthetic life) স্তর। kirekgaard মতে নান্দনিক জীবনের স্তরের ক্ষেত্রে আমরা দুটি জীবন লক্ষ্য করি। যথা প্রাকৃত সূক্ষ্ম নান্দনিক জীবন (Sohisticated aestheticism), আদিম সূক্ষ্ম নান্দনিক স্তর (Primitive sohisticated Aesthecticism)। তিনি বলেন যে ব্যাক্তির জীবনের নান্দনিক স্তরে দান্দিকতা (Dialectic) লক্ষ্য করা যায়। এই নান্দনিকতার জীবনের মধ্যে থেকে ব্যাক্তি একটি সময়ের পর নান্দনিক জীবনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা তৈরি হয় বা আতিবাহিত হয়। কেননা এই স্তরে ব্যাক্তি ইন্দ্রিয় সুখের ক্রমশ অন্বেষণ করতে করতে ব্যাক্তি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এর থেকে ব্যাক্তি একটি সময়ের পর উপলব্ধি করে যে কেবলমাত্র এই ইন্দ্রিয় সুখ ব্যাক্তি জীবন আনন্দ বা সুখ দিতে পারেনি। এর থেকে ব্যাক্তি প্রাথমিক ভাবে এই নান্দনিক স্তরে জীবনে বিরক্ত ভাব সম্পর্ক বা অবসাদ গ্রস্ত বা একঘেয়েমি হয়ে ওটে। তাই ব্যাক্তি এই নান্দনিক স্তর থেকে প্রাকৃত সূক্ষ্ম নান্দনিক জাগত কে খুঁজে পাওয়ার জন্য ব্যাক্তি নিজের থেকে একটি জগত তৈরী করে। যেখানে ব্যাক্তি একটি বিমূর্ত জগতের এর সৃষ্টি করে। এই স্তরে ব্যাক্তি তার নিজস্ব বিমূর্ত আচারন করে। ব্যাক্তি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে বাস্তব জগতের থেকে দূরে সরে গিয়া নিজ ভাবনার জগতে বিচরন করে। ব্যাক্তি জীবনের এই স্তর কে প্রাকৃত সূক্ষ্ম নান্দনিক স্তর (Sophisticated Aestheticism life) বলে। এই স্তরটি নান্দনিক স্তরের(Aesthetic life) এর দ্বিতীয় স্তর।

নান্দনিক স্তর এর প্রাথমিক স্তর হল আদিম স্থূল নান্দনিক (Primitive Aesthetictism) স্তর। এই স্তরে ব্যাক্তি তাদের অবসাদগ্রস্ত বা ক্লান্তি কে সুখে রুপান্তরিত করার চেস্টা করে এবং ব্যাক্তি আরও ইন্দ্রিয় সুখে নিমজ্জিত থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাক্তি মনেকরেন যে এই জীবনের দুঃখ কোষ্ঠ গুলি তাদের সুখের অঙ্গ।

Ethical life (নৈতিকতার জীবন): মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক স্তর হল নৈতিক স্ত। ব্যাক্তি মানুষের জীবনের দ্বিতীয় স্তর হল নৈতিকতা। মানুষের জীবনের নৈতিকতার স্তর মুলত তিনটি ধারনার ওপর নির্ভর করে। যথা- সার্বজনীনতা (Universality), বৌদ্ধিক (Rationality), কর্তব্য (Duty)।

***সার্বজনীনতা** (Universality): kierkegaard বলেন যে কোনো আদর্শ নৈতিক হয় তাহলে সেই আদর্শের সার্বজনীনতা থাকতে হবে।এই ধরনের কথা আমরা কান্টের নীতি তত্ব এতে পাই। কান্টও একই মত প্রকাশ পোষণ করেন যে সার্বজনীনতার (Universality) এর দ্বারা নৈতিক আদর্শ নির্ভর করে।অর্থাৎ সার্বজনীনতা ছাড়া নৈতিকতার ধারনা অসম্ভব।

***বৌদ্ধিকতা** (Rationality): kierkegaard বৌদ্ধিকতার (Rationality) ধারনার প্রসঙ্গে বলতে গিয়া একটি প্রশ্ন তোলেন যে, কোনো নৈতিক আদর্শ যে সর্বজনীন হবে তা আমরা কি করে বুজব? এর উত্তর আমরা কান্টের নীতি ত্বতে পাই, সেই সকল ধারনা বা আদর্শ সর্বজনীন হবে যদি তা যুক্তি (reason) দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় ।তাই বলা যায় যে যদি কোনো আদর্শ বৈধ যুক্তি থেকে আসে ,তাহলে সেই আদর্শ সর্বজ্ঞনী (Universal) এবং সেটি (objective) বা পরম (absolute) হবে।

***কর্তব্য** (Duty): ব্যাক্তি নিরপেক্ষ ধারনার থেকে নৈতিক কাজের ধারনাটি আসে। যদি ব্যাক্তির নৈতিকতার ধারনার মধ্যে নিরপেক্ষতার ধারণা না থাকে, তাহলে ব্যাক্তির কোনো কাজের বিচার করা যাবে না। এই বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতা আমরা কেবলমাত্র কর্তব্যের মধ্যে দেখতে পাই। তাই কর্তব্য (Duty) কে বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ বোধ বলা হয়।

উপরিক্তত আলোচনা থেকে দেখতে পেলাম যে উক্ত তিনটি ধারনার একটিকেও বাদ দিয়ে নৈতিকতার বধ বা ধারনাকে ভাবতে পারিনা।

প্রসঙ্গত উল্লেখিত বিষয় এই যে, kierkegaard উপরোক্ত যে বিষয় গুলি নৈতিকতা প্রসঙ্গে বলেছেন তা মূলত কান্টের নৈতিকতার ধারনার থেকে বলেছেন ।কিন্তু পূর্বে তিনি কান্টের নৈতিকতার ধারনা গুলি গ্রহন করলেও পরবর্তী কালে তিনি নৈতিকতার ধারনার থেকে সরে এসেছিলেন এবং কান্টের মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি।

এক্ষেত্রে আমরা্ কান্টের নীতি দর্শনের প্রধান দুটি দিক আলোচনা করব,

প্রথমত, কান্ট তাঁর নীতিতত্ব এতে বলেন যে নৈতিক আদর্শ কে সর্বজনীন (Universal) হতে হবে এবং একই সঙ্গে ঐ সর্বজনীনতার(Universality) এর ধারনাটি বৌদ্ধিকতার (Rationality) এর দ্বারা প্রতিষ্টিত হবে।এই যুক্তি থেকেই একটি নৈতিক আদর্শ সর্বজনীন হবে। নৈতিকতার ধারনার প্রসঙ্গে কান্টের এই রূপ কথার সঙ্গে kierkegaard সহমতপোষণ করেন।

দ্বিতীয়ত, কান্টের মতে, যা কিছু বৌদ্ধিক (Rationality) দ্বারা যাচাই করা যায় ,তারই 'চূড়ান্ত ন্যায্যতা' (ultimate justification) আছে। আর যুক্তি হল নৈতিকতার আসল চাবিকাটি। কান্টের এই বক্তব্যটি কে kierkegaard সহমত পোষণ করেন না। এক্ষেত্রে kierkegaard বলেন যে যুক্তি (reason) কোনো কিছু যাচাই করছে বলেই এবং তা সর্বজনীন (universal) হলেই যে সেটি 'চূড়ান্ত ন্যায্যতা' (Ultimate Jistification) হবে এমন তা নয়।

Kirekegaard এর মতে 'চূড়ান্ত ন্যায্যতা' (Ultimate Justification) হল অবৌদ্ধিক ।কেননা চূড়ান্ত ন্যায্যতা কে কোনো যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ মানুষের জীবনে কোনো কিছু চূড়ান্ত ন্যায্যতা (ultiimate justification) বলে কিছু নেই। তিনি বস্তুগত (objective point) দিক থেকে যে, ব্যাক্তির 'চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি' (ultimate commitment) থেকে চূড়ান্ত ন্যায্যতা (Ultimatly justification) আসে। এখানে 'ultimate' শব্দতি বিষয়গত (subjective) অরথে গ্রহন করা হয়েছে, যা ব্যাক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ধারনা। kirekegaard এর মতে, ব্যাক্তির স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার ধারনার থেকে ব্যাক্তির চূড়ান্ত ন্যায্যতা (Ultimate Justification) নির্ণয় হয়। আর ব্যাক্তি তাঁর এই চূড়ান্ত স্বতঃস্ফূর্তটা থেকে নান্দনিক জীবন অনুসরণ করে। মানুষের নৈতিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃষ্ট উদাহরণ সরূপ সক্রেটিস এর কথা বলতে পারি।সক্রেটিস বলেন যে জ্ঞানীই হল সত্য, জ্ঞানীই ধর্ম, জ্ঞানীই ন্যায়,জ্ঞাণী হল সততা, -এই সকল জ্ঞান মানুষের মধ্যেই আছে। তিনি বলেন, মানুষের নৈতিক জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল মহৎ গুনগুলি কে অনুশীলন করে যাওয়া। এক্ষেত্রে 'মহৎ' এর অর্থ হল ন্যায় পরায়ণতা। মানুষের প্রতি ভালবাসা, স্রদ্ধা, আত্ম মর্যাদা বোধ, আত্ম নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, এইগুলি হল মানুষের মধ্যে মহৎ গুন। এই মহৎ গুন গুলির অনুশীলন হল নৈতিক জীবন যাপন করা এবং এর দ্বারা সামাজিক নৈতিকতা প্রতিষ্টা করা। আর এখানেই সক্রেটিস এবং কান্টের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কেননা তাঁরা দুজনেই সর্বজনীনতা (Universal)

এর আদর্শ কে নৈতিক জীবনের প্রধান গুন বলে প্রতিষ্টিত করেছেন। কান্টের মতে নৈতিকতার জীবনে সর্বজনীনতা (Universal) আদর্শনীতি মেনে চলা।আর সক্রেটিস এর মতে সর্বজনীনতা (Universal) হল মহৎ গুনের অনুশীলন করাই হল নৈতিক জীবন যাপন করা।

কিন্তু kirekegaard বলেন, ব্যাক্তি নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে এই সকল মহৎ গুন গুলি অনুশীলন করে চলে, এক্ষেত্রে সর্বজনীনতা নীতির প্রভাব থাকে না।ব্যাক্তি জীবনে এই 'virtue' গুলি মানবিক সম্পর্ক কে আরো বেশি মহৎ করে তুলে পারে। এক্ষেত্রে kirekegaard অস্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কতক গুলি মানবিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। ব্যাক্তি এই মানবিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ওপর সম্পর্কের প্রতি সচেতন হয়, অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা সেখায়, অপরের জন্য প্রাথমিক ভাবে দায়বদ্ধতা হতে শেখায়। তিনি ব্যাক্তির তিনটি মানবিক সম্পর্কের কথা বলে যথা, বৈবাহিক সম্পর্ক (Marriage life), বন্ধুত্ব সম্পর্ক (Friendship Relation), বৃত্তি সম্পর্ক (Propfessionsal Relation), উক্ত মানবিক সম্পর্কের দ্বারা ব্যাক্তি নৈতিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়।

***বৈবাহিক সম্পর্ক (Marriage life):** বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যাক্তি অপরের সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে সচেতন হয়, অন্যনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে শেখে,। অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে Mutual trust, Muutual love, mutual Respect, এই তিনটি সম্পর্ক হল বৈবাহিক সম্পর্কের মানদণ্ড। kirekegaard এর মতে, বিশ্বাস, ভালবাসা, সম্মান করা, ইত্যাদি এইগুলি সব দ্বিমুখী বা উভয়মুখী সম্পর্ক। বৈবাহিক সম্পর্ক আমাদের কে শেখায় বন্ধুত্ব ,ভালবাসা ,সম্মান করতে। এই সকল বিষয় ছাড়া কোনো ব্যাক্তি দ্বায়বদ্ধ হতে পারে না

***বন্ধুত্ব সম্পর্ক (Friendship Relation):** বন্ধুত্ব সম্পর্ক এর মাধ্যমে ব্যাক্তি অপরের প্রতি দ্বায়বদ্ধ হতে শেখে, অন্যের জান্য ত্যাগ করতে শেখে, অপর কে শ্রদ্ধা এবং অপরকে ভালবাসতে শিখি। তিনি বলেন বন্ধুত্ব সম্পর্ক কে কোনো প্রকার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বন্ধুত্ব সম্পর্কটি অবৈদ্ধিক।

***বৃত্তিগত সম্পর্ক (Professional relation):** বৃত্তি সম্পর্কের এক্ষেত্রেও ব্যাক্তি দায়বদ্ধতা হতে শেখে, একে অপরে সঙ্গে সুবিধা অসুবিধা গুলি শেয়ার করতে শেখে। এই সকল সম্পর্কের দারা দ্বারা মানুষ প্রাথমিক ভাবে নৈতিক হয়ে ওটে।

প্রসঙ্গত উল্লেখিত বিষয় হল নৈতিক জীবনের একেবারে শেষে এসে দেখা যায় যে নৈতিক জীবন মানুষ কে পাপ বোধ জনিত হতাশা থেকে মুক্ত করতে পারে না। এমন কতকগুলি ক্ষেত্র উল্লেখ করা হল –আমরা অনেক সময় নৈতিক আদর্শের মধ্যে স্ববিরোধীতা দেখতে পাই। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে ধরাযাক যেখানে কোনো নীতি আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছে, সেখানে ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখা যাছে তার বিরুদ্ধে নৈতিক আদর্শ গ্রহন করা হয়। আমরা অনেক সময় ইতিহাসে দেখতে পাই যে, যেখানে এমন কিছু মহৎ নীতি বা আদর্শ রয়েছে যা মহৎ ব্যাক্তিরা অনুসরণ করেছেন। আবার কিছু মহান ব্যাক্তি তার বিরুদ্ধ নীতি কেই অনুসরণ করেছে। যেমন গান্ধীজী, যীশু অহিংসা (non-violence) কেই অনুসরণ করেছেন। আবার একদল মহান ব্যাক্তি বলেছেন হিংসা (violence) হল উপায় যাকে অবলম্বন করলেই আমরা মহৎ সমাজ গড়ে তুলতে পারি। যেমন karl marx এর মতে হিংসা কে হিংসা দিয়েই প্রতিহত করা সম্ভব তাই এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাছি যে একদল মানুষ হিংসার কথা বলছেন। আবার অন্যদল অহিংসার কথা বলছেন। তাই নৈতিক আদর্শ এর মান্যতা নিয়ে সংশয় থেকেই যাছে। এক্ষেত্রে কোনো আদর্শই চরম বা পরম নয় ।অর্থাৎ নৈতিকতার ক্ষেত্রে স্ববিরোধীতা দেখা যায়।

এছাড়াও আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আসে, যেখানে নৈতিক আদর্শ অনুসরন করা সত্ত্বেও আমাদের পাপবোধের হতাশা থেকে মুক্ত হতে পারি না। তাই আমদের ভিতরে একটি নিরপত্তাহীনতা

থেকেই যায়। এমন একটি ক্ষেত্র হল –আমি সত্য কথা বলে আমার নৈতিকতা রক্ষা করলাম, কিন্তু আমার এই কথা বলার জন্য যে একজনের প্রান গেল; আর এর থেকে আমার মধ্যে একটি হতাশার সৃষ্টি হয়। ,তাই এক্ষেত্রে একট প্রশ্ন থেকে যায় যে এই পাপ বোধ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব? আমি এক্ষেত্রে কোনো মানসিক শান্তি পাইনা। তাই দেখা যাছে যে এই নৈতিক আদর্শ মেনে চললেও এক্ষেত্রে ব্যাক্তি চরম হতাশা থেকেই যায়। এক্ষেত্রে ব্যাক্তির জীবনে ভাল মন্দ পার্থক্যের অতিরিক্ত কিছু থেকে যাছে। আর এর অতিরিক্তি কিছু হল ঈশ্বর। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে আমাদের কোনটা শুভ, কোনটি অশুভ তার পার্থক্য ঈশ্বরে অতিবর্তী হয়ে যায়। এর থেকে ব্যাক্তি আস্তে আস্তে নৈতিক জীবন থেকে ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের প্রবনতা দেখা যায়।

ধর্মীয় জীবন (Religious life): ব্যাক্তি মানুষের আস্তিত্বের আন্তিম স্তর হল ধর্মীয় জীবন। kierkeggard এর মতে, ব্যাক্তি তার নিজের আত্ম উপলদ্ধি দ্বারা ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে তিনি প্রথাগত অর্থ গ্রহন করেননি। কেননা তাঁর কাছে ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্টানিক প্রথাগত ধর্মের কোনো অর্থ নেই। কেননা প্রাতিষ্টানিক ধর্ম কতগুলি প্রথার পালন এবং আচারণ বিধির ওপর নির্ভর করে গড়ে ওটে। প্রসঙ্গত উল্লেখিত বিষয় হল kirekegaard এক্ষেত্রে ধর্ম বলতে মুলত খ্রিস্টীয় ধর্ম কে বুজিয়েছেন। যেখানে ব্যাক্তি কোনো রকম শর্ত ছাড়াই ব্যাক্তি খ্রিস্টান ধর্ম এর আচারণ গুলি পালন করে থাকে। তিনি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে খ্রিষ্টীয় ধর্ম কে বর্ণনা করে বলেছেন, শুধুমাত্র খ্রিস্টান ধরম পালন নয়, শুধুমাত্র আচারবিধি পালন নয়, এক্ষেত্রে ব্যাক্তি কে নিজেকেও খ্রিস্টান হয়ে ওটতে হবে। এজন্য ব্যাক্তিকে খ্রিস্টান হয়ে ওটার জন্য অর্জন করতে হবে। কেননা প্রকৃত খ্রিস্টান হওয়াটা ব্যাক্তির উপলব্ধির বিষয় এবং প্রকৃত খ্রিস্টান হওয়াটাও পূর্ণ ঈশ্বর এর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকা। এই খ্রিস্টান ধর্ম প্রধানত তিনটি মৌলিক ধারনার অপর প্রতিষ্টিত, যথা- পাপবোধ (sin), দুঃখবোধ (suffering), বিশ্বাস (Faith)।

প্রথমত, পাপবোধ(sin)**:** সকল ব্যাক্তির মধ্যে পাপবোধ বিধ্যমান ।আর ব্যাক্তির মধ্যে যে পাপবোধ থাকে তা সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত। ব্যাক্তির মধ্যে থাকা পাপ বোধ থেকেই ব্যাক্তির ঈশ্বরের (God) উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ ব্যাক্তির মধ্যে পাপবোধ ধারনার উপলব্ধি না হলে, ব্যাক্তির ঈশ্বররে উপলব্ধি হবে না।

দ্বিতীয়ত, দুঃখবোধ (suffering): জগতের সকল ব্যাক্তি মানুষের মধ্যে পাপবোধ থাকে বলেই মানুষকে এত দুখ-কষ্ট ভগ করতে হয়।এই পাপবোধ থেকেই মানুষের দুঃখ কষ্টের অনুভূত হয়।এই কষ্টবোধ সম্পূর্ণ ব্যাক্তির আভ্যন্তরীণ এবং ব্যাক্তি গত। সেইজন্য মানুষের অভ্যন্তরীণ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির মনোভাব তৈরি হয়।

তৃতীয়ত, (Faith): ব্যাক্তির উপরোক্ত দুটি প্রকার বোধ থেকে মুক্ত হতে গেলে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এর জন্য ব্যাক্তি কে ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। তবেই ব্যাক্তি পাপবোধ এবং কষ্টবোধ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

Kirekegaard বলেন যে উপরক্ত তিনটি মৌলিক ধারনা ছাড়া কোনো ব্যাক্তি প্রকৃত খ্রিস্টান হতে পারবে না। তাই ব্যাক্তি কে একক ভাবে ইশরের কাছে সম্মুখীন হতে হবে এবং ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস রাখতে হবে।তিনি ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে যে ঈশ্বরের কথা বলেছেন তা অতিবর্তী (Transendental God)। কারন তাঁর মতে ঈশ্বর হল অসীম, পূর্ণ, অনন্ত, ঈশ্বর কে কোন প্রকার যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, ঈশ্বর দেশ কাল কে অতিক্রম করে। অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞানের কোনো বিষয় হয়না। kirekegaard বলেন যে, যেহেতু খ্রিস্টান ধর্ম ও ঈশ্বর কে কোনো প্রকার যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না বলে, তিনি খ্রিস্টান ধর্ম ও ঈশ্বর কে

অবৌদ্ধিক বলে আখ্যায়িত দিয়েছেন। আমরা সাধারণত জানি যে ব্যাক্তি কখনই যুক্তি দিয়ে ধর্মীও জীবন গ্রহন করেন না, ব্যাক্তি পাপবোধ (sin), দুঃখবোধ (suffering), বিশ্বাস (faith), দিয়ে ধর্মীয় জীবন নির্বাচন করে, এই ধারনা গুলি সম্পূর্ণ ব্যাক্তি গত। আর ব্যাক্তি গত ধারনা গুলি কে কখনই যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না ।এক্ষেত্রে ব্যাক্তি কোন রকম যুক্তি ছাড়াই ধর্মীও জীবন নির্বাচন করে।

Kirekegaard ধর্মীয় জীবনের ক্ষেত্রে কর্ত্রী হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষকের কথা বলেছেন। এই সকল ধর্মীয় শিক্ষক হল – কৃষ্ণা, যিশু, বৌদ্ধদেব, এনারা আমদের কে সত্য ধর্মের পথ দেখায়। যেমন যিশু বলেছেন যে মানুষ যদি পাপবোধ থেকে মুক্ত হতে চায় তাহলে তাকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে এবং ঈশ্বর কে ভালবাসতে হবে এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করতে হবে। ধর্মীয় স্তরে বিশ্বাস, ভালবাসা, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি দ্বারা ব্যাক্তি ধর্ম কে বিশ্বাস করতে পারে। আর যে ব্যাক্তি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা রাখে, তাদের মধ্যে ঘৃণা বোধ, পাপবোধ, কষ্ট বধ থাকবে না। এই ভাবের মানুষ ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে এবং ধর্মীয় জীবন যাপন করে।

মুল্যায়নঃ kirekegaard তাঁর দর্শনে মানব 'অস্তিত্ব' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মানব জীবনের যে তিনটি স্তরের কথা বলেছেন, যথা নান্দনিক জীবন, নৈতিক জীবন, ধর্মীয় জীবন। এই তিনটি স্তর বাস্তবে ব্যাক্তি মানুষের জীবনে বেশি দেখা যায়। কিন্তু kirekegaard মনে করেন, যে ব্যাক্তি জীবনের সকল স্তরে বিচরণ করবে এমন কথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। ব্যাক্তি তাঁর সারা জীবন নান্দনিক স্তরে কাটিয়ে দিতে পারে,আবার বেশিরভাগ ব্যাক্তির জীবন দুটি স্তরে ঘোরা ফেরা করে। কিন্তু বাস্তবে kirekegaard এর এমন উক্তি কতটা যুক্তি যুক্ত তার একটি পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করার চেষ্টা করব। আমার মতে ব্যাক্তি যদি কেবলমাত্র নান্দনিক স্তরে জীবন কাটিয়ে দেয়, তাহলে ব্যাক্তির জীবনে দায়িত্ববোধ, কর্তব্য বোধ, শৃঙ্খলা বোধ, ইত্যাদির উপলব্ধি হবে না। কেননা নান্দনিক জীবনে ব্যাক্তি কেবল তাঁর নিজস্ব স্বাধীনতার গ্রাহ্যতা দেয়,এখানে ব্যাক্তি কেবলমাত্র নিজের তৈরি করা বিমূর্ত জগতে সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে মাত্র। আবার ব্যাক্তি যদি কেবলমাত্র দুটি স্তর নান্দনিক স্তর এবং নৈতিক স্তরে জীবন কাটিয়ে দেয়। তাহলে ব্যাক্তির মধ্যে সৃষ্টিশীল কাজের প্রবণতা থাকবে, স্বাধীন ভাবে কাজ করতে পারবে, একে অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকবে, কর্তব্য বোধ থাকবে, শৃঙ্খলা বোধ থাকবে। কিন্তু ব্যাক্তি মানুষের মধ্যে আত্ম বোধ, আত্ম উপলব্ধি, আত্ম মূল্যায়ন, আত্ম সমর্পণ ইত্যাদির এই সকল প্রকার গুন গুলির প্রকাশ ঘটবে না। ব্যাক্তির মধ্যে এই সকল মহৎ গুন গুলি ধর্মীয় জীবনের দ্বারা উপলব্ধি হয়। আমরা সকলে জানি যে মানুষের মধ্যে কতক গুলি মহৎ গুন বর্তমান থাকায় জগতে মানুষ হল একমাত্র বৌদ্ধিক জীব।এই গুন গুলি হল, সৃষ্টিশীল, স্বাধীনচেতা, নৈতিক বোধ, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য বোধ, শৃঙ্খলা বোধ, আত্ম উপলব্ধি, আত্ম মুল্যায়ন, আত্ম সমর্পণ বোধ, ইত্যাদি। তাই আমার মনে হয় যে, ব্যাক্তি জীবনের প্রথম স্তর থেকে একেবারে শেষ স্তর পর্যন্ত যেতে পারে না, এমন তা বলা যুক্তি যুক্ত হবে না। আমরা এটা বাস্তবে দেখি যে মানুষের জীবনে নান্দনিক এবং নৈতিক স্তর বেশি প্রভাব থাকে। কিন্তু ব্যাক্তি শেষ জীবনে আসে তার নিজের বিবেকের বোধ এর উপলব্ধি হয়, কারন ব্যাক্তি কখনও নিজের বিবেক কে এড়িয়ে চলতে পারে না। আর ব্যাক্তি তার বিবেক দ্বারা নিজের কাজের মুল্যায়ন, আত্ম উপলব্ধি, আত্ম সমর্পণ ভাব, আসে। আর এর ফলে ব্যাক্তি আস্তে আস্তে কোথাও যেন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর সকল মনোভাব সমর্পণ করে। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে ব্যাক্তি মানুষের জীবনে নান্দনিক স্তর এবং নৈতিক স্তরের ক্ষেত্রে ব্যাক্তির আচরণ গুলি যে ভাবে বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ হয়। কিন্তু সেই ব্যাক্তি মানুষের জীবনে ধর্মীয় জীবনের ঈশ্বরের উপলব্ধি করা বা আত্ম

উপলব্ধি করা এই বিষয় গুলি সুপ্ত ভাবে থাকে, এই আচারণ গুলি বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ দেখা যায়না। তাই বাস্তবে ব্যাক্তি জীবনে অস্তিত্বের সকল স্তরের (নান্দনিক স্তর, নৈতিক স্তর, ধর্মীয় স্তর) সমান প্রভাব না থাকলেও, তা কম বেশি প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং মানব জীবনের তিনটি স্তর বাস্তব জীবনের অস্তিত্বের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্ব পূর্ণ ভুমিকা দেখা যায়।

তথ্যসূত্রঃ

1) Solemon, R, c ,(1970), from Rationalism to Exisentialism, New york: Harper & Row.
2) Cooper, E, D, David (1999), Existentionalism, USA: Blackwell publishers.
3) Macquarrie, John, (1973). Existentionalism. USA: penguin books Publishers.
4) ভদ্র, মৃণাল কান্তি, (1995); অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ, বর্ধমানঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যাল।
5) সরকার, স্বপ্না, (2016), অস্তিবাদ ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
6) ঘোষ, সাঞ্জীব, (2019), প্রাতিভাসিক ও অস্তিবাদ, কলকাতাঃ ব্যানার্জী পাবলিশার্স।
7) Blackham, H, J, (1965), Six Existentialist thinkiers, London: Routedge & kegan poul ltd.